হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরী ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠেনি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলামাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে - ফল শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে যাবার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করিনি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনব না, ব্যাঙের ডাক শুনবো না, চৈত্র মাসের খোলা ছাদে পাটি পেতে বসবো না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরবো না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তারা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে উঠে। আমার কাছে ভ্রমনের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা হাতে বই, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকবো, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়ছে। আমার কল্পনা শক্তি ভালো। লেখক তার চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তার চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কি?

প্রেইরী ভূমি সম্পর্কে আমি ভালো জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে । নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো একটা রসকষহীন বিষয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী নিতে হবে। কতো দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্য বইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিকটিক। খানিক্টা হলেও স্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

মন খারাপ হবার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতেরো বছর

বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টের আরো অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিলো। সারাক্ষণই সে একটু দূরে-দূরে সরে রইলো। এই বয়সেই সন্তান ধারনের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়েরাগ মুহূর্তে সে বলল, "আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?"

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মত অবস্থা হলো। ইচ্ছে করলো টিকিট এবং পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি, "চলো, বাসায় যাই"।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের কত আয়োজন-পাস, ডিগ্রী, চাকরি, প্রমোশন, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর-কোনো মানে হয়? কোনোই মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা সে টের পেল। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বলল, "যদি ছেলে হয় তাহলে নাম রাখব আমি। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে নাম রাখবে তুমি। কেমন?"

প্লেনে আসতে আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কতো লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনটাই আমার মনে ধরছে না। কোনোটাই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্য খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠারো, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো-এক প্রেমিক পুরুষ এই নামে আমার মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কতো না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশির ভাগ ইচ্ছাই খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এতো ভোরে আমাকে কেউ নিতে আসবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রতিবছর হাজার খানিক বিদেশি ছাত্র নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এতো গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার?

"তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র-আহামাদ?" আমি চমকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরেরে যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে বেশিক্ষন তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী। যে পোশাক তাঁর গায়ে তাঁর উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন- তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহমাদ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

: আমার নাম টয়লা ক্লেইন। আমি হচ্ছি নর্থডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওয়ানা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গের জিনিসপত্র কি এই?

: ইয়েস।

আমার সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বললেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

: আহামাদ, তুমি কি রওয়ানা হবার আগে এক কাপ কফি খাবে? বাইরে বেশ ঠান্ডা। হঠাত কেন জানি ঠান্ডা পড়ে গেছে। কফি আনবো?

: না।

: আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, পূর্বদেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছু খাবার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাঁদের খাবার ইচ্ছা আছে। আমি শুনেছি 'না' বলাটা তাঁদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি- তুমি কি কফি খেতে চাও?

: চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাই নি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, "খুব ভালো"।

টয়লা ক্লেইন হেসে ফেললেন, "আহামাদ তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সব কিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে-ভালো। খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুঁড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।"

আমি ইয়াক বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাপ ছুঁড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে আমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়লা ক্লেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সিটে বসে আছি। আশেপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্লেইন একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোন অসুবিধা হলো না।

আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায়না। ব্রিটিশরা অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়। যা বলে তা-ও বলার আগে মুখে খানিকক্ষণ রেখে গাগল করে বলে আমার ধারণা।

: আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইনে'। হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে হোটেলের ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশুনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পারো। হোটেলের সব সুযোগ-সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বল রুম আছে, সাওয়ান আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোন সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘন্টা পরপর ইউনিভার্সিটির বাস যায়। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ তো?

: পারছি।

: তুমি এসেছো একটা অড টাইমে, স্প্রীং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগার দিনের মত বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না?

: ইয়েস।

টয়লা ক্লেইন হেসে বললেন, "ইয়েস এবং নো এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরো কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিদ্রুত কি সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মত মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার একবর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজীতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এরকম – মিসেস টয়লা ক্লেইন, আপনি যে এই ভোররাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্লেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা।

পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেল গ্রেভার ইনে আমার জীবন শুরু হল।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরোনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরোনো, কার্পেট পুরোনো, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত একশ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরোনো হোটেলগুলোকে পুরোনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। যত্ন করে ঝুলানো আগের আমলের পাইপ গান, বাবুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারি কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তোবা এসব দেখে নস্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুললো?

আমার ঘরটা দোতালায়। বিরাট ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরের আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়লো না। তবে দেয়ালজোড়া পুরোনো কালের আয়নাটা অপূর্ব। যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে জমিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এরকম চমৎকার আয়না এযুগে তৈরি হয় কিনা আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বুই বা একশ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ্য করলাম গেস্টদের প্রায় সবই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেনীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ না। ওল্ডহোমগুলোতে তারা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ড হাউজগুলোকে দেখে করুনার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না-সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল পথের পাঁচালী ছবির ইন্দিরা ঠাকুরণের মত। মাথার চুল সেইরকম ছোট করে কাটা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতচ্ছিন্ন শাড়ির বদলে স্কারট, ঠোটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার একঘন্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, "সুপ্রভাত, তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে?"

: না।

: স্ট্যাম্প আছে?

: না, তাও নেই।

: ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটাই জমাই। এটা আমার হবি।

বৃদ্ধা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ ক'টি দিন মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোন সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই? বৃদ্ধা চলে যাবার পর হোটেল লন্ড্রির লোক ঢুকলো।